

ম্যাসেজ

আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া

মিজানুর রহমান আজহারি



গার্ডিয়ান

পা ব লি কে শ ন স

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অপার করুণায় সকল ভালো কাজ পূর্ণতা পায়। দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি সত্যের বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে আমাদের আহ্বান করেছেন। ২০২১ সালের বইমেলায় ‘ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া’ শিরোনামে প্রকাশিত বইটি বাংলা ভাষায় আমার প্রথম কাজ। নিজেকে বাংলা সাহিত্য-দুনিয়ায় যুক্ত করতে পেরে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ। জ্ঞান-দুনিয়ার দুর্বল ছাত্র। প্রতি মুহূর্তে নিত্য-নতুন কিছু জানার চেষ্টা করছি। সত্যের অনুপম ছোঁয়ায় নিজেকে ঋদ্ধ করার অবিরত এক সংগ্রামে আছি। তীর পেরিয়ে জ্ঞান-সমুদ্রের যত গভীরে প্রবেশ করছি, নিজেকে তত দুর্বল, অসহায়, অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষুদ্র হিসেবে আবিষ্কার করছি। রবের দুনিয়া কত বড়ো, তাঁর কত নিয়ামতে ডুবে আছি আমরা! পৃথিবীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের মণি-মুক্তা, রত্ন! কটা ভাঁজেই আর বিচরণ করা যায়!

নিজের সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও উম্মাহর তরুণদের নিয়ে কেন জানি পেরেশানিতে ভুগি। একুশ শতকের তারুণ্য কী এক মরীচিকার পেছনে ছুটছে! এই প্রজন্মেরই একজন হয়ে খুব করে তাদের মানসপটকে বোঝার চেষ্টা করি। তাদের লাইফস্টাইল, চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতা বেশ বুঝতে পারি। তাদের বডি ল্যান্ডস্কেপ, কথার টোন, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকে উপলব্ধি করতে পারি। মূলত, আমার ক্ষুদ্র কর্মতৎপরতা এই তরুণদের ঘিরেই। তাদের জন্য ভাবি, বলি, লিখি, কন্টেন্ট তৈরি করি। কারণ, এই প্রজন্মকে যদি সঠিক পরিবহনে তুলে দেওয়া যায়, তাহলে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছবেই। ভুল গাড়িতে উঠিয়ে হা-হতাশ করে কী লাভ!

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কুরআনের ম্যাসেজ পৌঁছে দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল রাব্বুল আলামিনের দয়ায়। একজন দাঈ হিসেবে সাধারণত কথা বলাটাই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা। গত সাত বছরের দাওয়াতি অভিযাত্রায় অনেক শ্রোতা আমার লিখিত বইয়ের আবেদন করেছেন। আমি জেনেছি—শোনার পাশাপাশি শ্রোতাদের বড়ো একটা অংশ পড়তে ভালোবাসেন। ইন্টেলেকচুয়াল সার্কলে বই ও সাহিত্যের একটা আলাদা আবেদন আছে। সাহিত্যাঙ্গনে একজন দাঈ চাইলেই কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারেন।

দাওয়াহর সাহিত্যিক প্রেজেন্টেশনও বেশ কার্যকর ও টেকসই। লেখনী মানেই স্থায়ী রেকর্ড—এই ভাবনা থেকেই লেখালিখির আগ্রহটা তৈরি হয়।

এই গ্রন্থে একেবারে ঐতিহাসিক ও এক্সক্লুসিভ কোনো তথ্য হয়তো পাবেন না; এ আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা। বলতে পারেন, কুরআনের কর্মী হিসেবে সাহিত্য-জগতে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা এই গ্রন্থ। সারা দেশে বিভিন্ন সময়ে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে আলোচনা করেছি, গ্রন্থের প্রতিটি লেখায় সেসব আলোচনার নোটই প্রাথমিক সোর্স। বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, লেখার চেয়ে বলা অনেক সহজ।

বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি, সাহাবিদের বক্তব্য, সালাফদের কথা, বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক স্কলারদের রেফারেন্সের পাশাপাশি আমার নিজস্ব একান্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। সাহিত্য-দুনিয়ায় বই মানেই যে শব্দের মারপ্যাঁচে ভারী ভারী কথা, এই গ্রন্থকে সেখান থেকে খানিকটা দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। রাশভারী কথামালা পরিহার করে সাধারণ মানুষের ভাষায় লেখাগুলো সাজানোর একটা প্রয়াস এখানে আছে। সকল ধর্ম, বয়স, শ্রেণি-পেশার পাঠক নিজেদের সাথে বইটিকে কানেক্ট করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

নতুন ধারার প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স’-কে পাশে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। পুরো গার্ডিয়ান টিম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। গ্রন্থটিকে পাঠকদের সামনে স্মার্টলি উপস্থাপন করতে বেশ কিছু তরুণ দিন-রাত শ্রম দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করছি।

মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। এই বইটিতে কোনো ভুল থাকবে না—এমন দাবি করার দুঃসাহস করছি না। মানবিক দুর্বলতার কারণে বিশেষ কোনো টাইপিং মিসটেক অথবা তথ্যগত কোনো অসংগতি আপনাদের চোখে পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন; পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য, মূল তাৎপর্য, স্পিরিট ও মধ্যমপন্থার শিক্ষা তুলে ধরতে বইটি কিছুটা হলেও অবদান রাখবে বলে আশা করছি। ‘ম্যাসেজ’ বইটিতে কিছু বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া লাগাতে বইটিকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন।

মিজানুর রহমান আজহারি

৩০ মার্চ, ২০২১

সূচিপত্র

কুরআনের মা	১১
মুমিনের হাতিয়ার	২৯
কুরআনিক শিষ্টাচার	৪৮
উমর দারাজ দিল	৮০
ডাবল স্ট্যান্ডার্ড	১০৩
উসরি ইউসরা : কষ্টের সাথে স্বস্তি	১৩২
রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন	১৫৬
শাস্ত্বত জীবনবিধান	১৭৩
স্মার্ট প্যারেন্টিং	২০১
মসজিদ : মুসলিম উম্মাহর নিউক্লিয়াস	২৩০
ঐশী বরকতের চাবি	২৬০
বিদায় বেলা	২৮০

কুরআনের মা

সূরা ফাতিহা পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বোধনী বক্তব্য (Maiden Speech), একটি সার্থক মানপত্র, একটি প্রার্থনা, একটি শ্রেষ্ঠ সারাংশ এবং একটি প্রতিষেধক। অসংখ্য গুণে গুণান্বিত এই ছোট সূরাটি কুরআনের প্রথম সূরা। এই সূরা দিয়েই কুরআনের সূচনা। আর ‘ফাতিহা’ শব্দের আক্ষরিক অর্থই হলো—শুরু বা সূচনা। এই সূরাকে ‘ফাতিহাতুল কিতাব’ বা কিতাবের ভূমিকা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ সূরার মধ্য দিয়েই খুলে যায় কুরআনের বিস্ময়কর জগতের দ্বার! এই সূরার পথ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়েই কুরআনের মহিমাম্বিত রূপ আমাদের গোচরে আসে।

সূরা ফাতিহা মূলত একটি প্রার্থনা; যা মানুষের জীবনের পথ ও পাথের বর্ণনা করে। এই সূরার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মাদিকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রার্থনা করার পদ্ধতি। এই সূরায় অঙ্কিত হয়েছে মানবকুলের জন্য সহজ-সরল ও সঠিক জীবন-পথের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এ সূরার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কুরআনের সামষ্টিক মহিমাম্বিত রূপ, বর্ণিত হয়েছে তার সারমর্ম। বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এই সূরায়। মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল মিলে যেমন একটি পরিপূর্ণ উদ্ভিদ হয়, তেমনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের সমন্বয়ে সূরা ফাতিহা পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

এই রব শব্দের ছয়টি অর্থ রয়েছে—

- الْمَالِكُ আল মালিক : যিনি সমস্ত কিছুর মালিক।
- السَّيِّدُ আস-সায়্যিদ : যিনি সবকিছুর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন।
- الْمُرَبِّيُّ আল মুরাব্বি : যিনি সমস্ত কিছুর বৃদ্ধি ও পরিপক্বতা (Growth and Maturity) নিশ্চিত করেন।
- الْمُرْشِدُ আল মুরশিদ : যিনি সবকিছুর পথ দেখান।
- الْقَيِّمُ আল কাইয়িম : যিনি সবকিছুর অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন।
- الْمُنْعِمُ আল মুনয়িম : যিনি সমস্ত কিছু উপহার দান করেন।

রব শব্দের পুরো অর্থ বুঝতে এই ছয়টি অর্থই আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এই অর্থগুলো সামনে রাখলে বুঝতে পারব—আমরা যে রবের প্রশংসা করি, তিনি কে।

রব শব্দের একটা অর্থ—মালিক। এজন্য কোনো বস্তুর মালিককে আরবি পরিভাষায় ‘রব্বুল মাল’ এবং বাড়ির মালিককে ‘রব্বুদ-দ্বার’ বলা হয়। মানুষ যাকে নিজের রিজিকদাতা ও প্রতিপালক বলে মনে করে, যার নিকট হতে মান-সম্মান, উন্নতি ও শান্তি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, মানুষ যাকে প্রভু, মনিব ও মালিকরূপে অবহিত করে এবং বাস্তবজীবনে যার আনুগত্য ও আদেশ পালন করে চলে, প্রকৃতার্থে তিনিই রব, প্রতিপালক। আমাদের যার যখন যেটা যতটুকু দরকার, তাকে তখন সেটা না চাইতেই যিনি ব্যবস্থা করে দেন, তিনিই হলেন রব।

আমরা মায়ের গর্ভে থাকাকালীন আল্লাহর কাছে কিছুই চাইতে পারিনি; তবুও আল্লাহ তায়ালা সেখানে আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। এরপর যখন ভূমিষ্ঠ হলাম, ‘ওয়া’ ‘ওয়া’ শব্দে কান্না করা ছাড়া তখনও কিছু বলতে পারিনি। তবুও দয়াময় আল্লাহ মায়ের বুকের ভেতর আমাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করতাম। এই সময় আমাদের দাঁতের কোনো দরকার ছিল না। ফলে আল্লাহ আমাদের দাঁত দেননি। এবার মানবশিশু কিছুটা বড়ো হতে লাগল। এখন ভাত, মাছ, মাংস এগুলো চিবোতে হবে; অর্থাৎ দাঁতের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়টিতে আল্লাহ চাওয়ার আগেই ধীরে ধীরে মুখের মধ্যে দাঁত সেট করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

মুমিনের হাতিয়ার

‘দুআ’ মাত্র দুই অক্ষরের একটি শব্দ। কিন্তু শব্দটির ক্ষমতার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি পরিমাপ করা সত্যিই বড় কঠিন। এ যেন মালিক ও দাসের মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার সেতু নির্মাণকারী এক কারিগর। একজন ক্ষুদ্র দাস আরশে আজিমের মালিকের কাছে মিনতি করছে, ভিক্ষা মাগছে আর মনিব উজার করে সব দিয়ে দিচ্ছেন—এ যেন ওয়ান টু ওয়ান বোঝাপড়া। কী দারুণ একটা ব্যাপার! সুবহানাল্লাহ।

দুআর মাধ্যমে আমরা মূলত আল্লাহর প্রতিটি নাম ও বিশেষত্বের স্বীকৃতি দিই। আমরা স্বীকৃতি দিই, তিনি আমাদের স্রষ্টা আর আমরা তাঁর অনুগত দাস। আমাদের লালন-পালন, নিয়ন্ত্রণ সবকিছুই তাঁর হাতে। আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তিনি শুনছেন, দেখছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। সবকিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। দুআ মানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ, উপাস্য হিসেবে তাঁর একক অধিকারের স্বীকৃতি।

দুআ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ উপহার। দুআ করা এবং দুআ চাওয়া দুটোই সুনাহ। দুআ একটি মহৎ ইবাদতও বটে। বিশ্বনবি বলেন—

‘আল্লাহর দৃষ্টিতে দুআর চেয়ে মহৎ কিছু নেই।’ (সহিহ বুখারি : ৫৩৯২)

দুআ একটা আর্ট বা শিল্প। একে রপ্ত করতে হয়, আত্মস্থ করতে হয়। সব কাজের মধ্যে যেমন ফাস্ট-ক্লাস, সেকেন্ড-ক্লাস, থার্ড-ক্লাস আছে, তেমনি দুআর মধ্যেও ফাস্ট-ক্লাস, সেকেন্ড-ক্লাস, থার্ড-ক্লাস আছে। কেউ ফাস্ট-ক্লাস দুআ করলে আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করে নেন। আর থার্ড-ক্লাস দুআ করলে সেই দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এমন অনেক দুআকারী আছে—যাদের দুআয় কোনো আবেগ ও ভাবাবেগ থাকে না। এ যেন রোবটিক দুআ—ফাঁপা, নিষ্প্রাণ; দুআ করার জন্য দুআ। এ রকম দুআ আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

দুআ করতে হবে আবেগ দিয়ে, যে আবেগ চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দেবে। হৃদয়কে করবে নরম, উর্বর। বান্দার চোখের পানি আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। অনুতপ্ত বান্দার

চোখের পানি নাকের ডগা বেয়ে মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তায়ালা তার দুআ কবুল করে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। দয়ার নবি বলেন—

‘দুই ধরনের ফোঁটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এক. অনুতপ্ত বান্দার চোখের অশ্রুর ফোঁটা; দুই. জিহাদের ময়দানে শহীদের রক্তের ফোঁটা।’
(জামে আত-তিরমিজি : ১৬৬৯)

দুআর শক্তি

দুআ মুমিনের অসাধারণ এক হাতিয়ার। দুনিয়ার সবকিছুর কারিশমা যেখানে শেষ, দুআর কারিশমা সেখান থেকেই শুরু। সব ক্ষমতা যেখানে অকার্যকর, দুআর ক্ষমতা সেখানেই কার্যকর। দুআর মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর কাছে ধরনা দেওয়া হয়। আর আল্লাহর দরবারে ‘না’ বলতে কিছু নেই; আছে শুধু ‘হ্যাঁ’। দুআর অসাধারণ কিছু শক্তি জেনে নেওয়া যাক।

দুআ ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার : মানুষের তাকদিরে সাধারণত কোনো পরিবর্তন হয় না। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন, কিন্তু দুআর বদৌলতে তাকদিরও পরিবর্তন হতে পারে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে—‘Everything is pre-written, but by supplication its re-written.’

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

‘দুআর বদৌলতে তাকদিরের কিছু অংশ বদলে যায়।’ (জামে তিরমিজি : ২১৩৯)

আমরা প্রায় সময় শুনি, অমুক রোগীর ক্যানসার; বেশিদিন বাঁচবে না। বাংলাদেশের সেরা ডাক্তার ঘোষণা দিয়েছেন, বাঁচলে সর্বোচ্চ ছয় মাস। কিন্তু দেখা যায়, সেই লোকটি আরও দশ বছর বেঁচে থাকে। এটা কীভাবে সম্ভব? কেবল দুআর বরকতেই সম্ভব হয়।

কুরআনিক শিষ্টাচার

একবার বনু তামিম গোত্রের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের এক লোক এসে নবিজিকে ডাকা শুরু করল—‘ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ’ বলে। নবিজিকে এভাবে আদবহীনভাবে ডাকাডাকি আল্লাহ পছন্দ করেননি। তাই আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল ইজ্জত এই আয়াতটি নাজিল করলেন। (মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪৪৮)

বন্ধুর বাড়িতে গেলে মানুষ বন্ধুকে যেভাবে নাম ধরে ডাকে, নবি ﷺ-এর বাড়িতে এসেও তারা একইভাবে তাঁকে ডাকতে শুরু করেছিল। এর বিপরীতে তাদের কী করা উচিত ছিল, তা আল্লাহ পরের আয়াতে বলে দিয়েছেন—

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ-


‘তুমি নিজেই বাইরে বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, সেটাই তাদের জন্য শ্রেয় হতো। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা হুজুরাত : ০৫)



আমরাও মাঝে মাঝে কারও বাড়িতে গেলে শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ডাকাডাকি করি, তাড়াহুড়ো করি, অস্থিরতা প্রকাশ করি—‘আরে! কতক্ষণ ধরে বসে আছি! আসে না ক্যান?’ হতে পারে—আমি যখন তার বাসায় এসেছি, তখন তার ঘুমের সময়। মনে রাখতে হবে, যার বাড়িতে গেলাম, সে-ও তো একজন মানুষ। তারও তো অনেক সুবিধা-অসুবিধা থাকতে পারে, তারও তো পেরেশানি আছে, তাই না? সুতরাং আমরা যে কারও বাসায় যাই না কেন, একটু ধৈর্য ধরব। তাকে সুন্দরভাবে উপস্থিত হওয়ার সময় দেবো। সবচেয়ে ভালো হয়—কোথাও যাওয়ার আগে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া। তার ব্যস্ততা আছে কি না জেনে নেওয়া। মোবাইলে কথা বলার ক্ষেত্রেও এই শিষ্টাচারগুলো স্মরণ রাখা উচিত। কারও বিশ্রাম, ঘুম, নামাজ, এমনকী ‘অফিস টাইমে’ ফোন দেওয়া উচিত না। কাউকে ফোন দেওয়ার পূর্বে এসব চিন্তা করা দরকার। আমরা অনেকেই একবার ফোন রিসিভ না করলে একের পর এক ফোন দিতেই থাকি। এমনও তো হতে পারে, ব্যক্তিটি নামাজে আছে কিংবা ওয়াশরুমে আছে। তাই একবার ফোন রিসিভ না করলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

এক্ষেত্রে স্ত্রীকে যদি স্বামীর ফোন রিসিভ করতেই হয়, তাহলে কথা বলার ক্ষেত্রে স্ত্রী অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। ফোন ধরে শুধু স্বামীর ব্যস্ততার কারণটা বলে কেটে দেবেন। অতিরিক্ত কথা একদম বলবেন না। কারণ, ফোনের এপাশ থেকে আপনি, ওপাশ থেকে পরপুরুষ আর মাঝখানে থাকে শয়তান!

উমর দারাজ দিল


উমর -এর ‘ফিরাসাহ’ বা দিব্যদৃষ্টি

একবার উমর  মসজিদে নববিতে জুমার খুতবা দেওয়ার সময় ছুট করে বলে উঠলেন—‘ইয়া সারিয়াতাল জাবাল’ অর্থাৎ ‘হে সারিয়া! পাহাড় অভিমুখে ছোটো।’ এই কথা তাঁর বক্তব্যের আগের বাক্যের সাথেও মিল নেই, পরের বাক্যের সাথেও মিল নেই। নামাজের পর সবাই জিজ্ঞেস করলেন—‘আমিরুল মুমিনিন! ছুট করে কেন আপনি এই কথাটি বললেন?’

উমর  বললেন—‘খুতবা দেওয়ার সময় দেখলাম, মুসলিম বাহিনী প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। মুসলিম বাহিনীর ডানে পাহাড়, বামে উপত্যকা। তাঁরা পাহাড়ের দিকে না গিয়ে উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলো; অথচ ওদিকে শত্রুরা ওত পেতে আছে। তাই তাঁদের সাবধান করতে বললাম—উপত্যকার দিকে নয়; পাহাড়ের দিকে যাও।’ এ কথা শুনে অনেকেই অবাক হলেন। উমর  আছেন মদিনায়। মদিনায় থেকে কীভাবে পারসে নির্দেশ করছেন? তখনকার সময়ে তো মোবাইল ছিল না, ছিল না আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা। তিনি কীভাবে এ কথা বললেন?

কিছুদিন পর ওই বাহিনী মদিনায় ফিরে এলো। কয়েকজন তাঁদের জিজ্ঞেস করল—‘অমুক দিন কি আপনারা এমন কোনো আওয়াজ শুনেছিলেন?’ তাঁরা বললেন—‘হ্যাঁ, আমরা আমিরুল মুমিনিনের আওয়াজ শুনেছিলাম। এর ফলে আল্লাহর রহমতে আমরা শত্রুর হাতে কচুকাটা হওয়া থেকে বেঁচে গেছি।’ (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১৩৫ পৃষ্ঠা)

উমর -এর ব্যক্তিত্ব

উমর  এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তিনি যেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, শয়তান সেই রাস্তার আশেপাশেও থাকত না। মদিনার মুনাফিকরা তাঁকে যমের মতো ভয় পেত।

বাচ্চারা রাতে খেতে না চাইলে আমরা তাদের বিড়াল, কুকুর, বাঘ অথবা ভূতের ভয় দেখাই। আর মদিনার মায়েরা বাচ্চাদের ভয় দেখাতে বলত—‘খাও খাও, ওই যে উমর আসছেন, উমর!’

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

চরিত্রের বেশ কিছু ধরন দৃশ্যমান। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক চরিত্র দিয়েই মানবসত্তাকে মূল্যায়ন করা হয়। তবে দুনিয়াতে সবচেয়ে ঘৃণিত চরিত্র—নিফাকি তথা কপটতা। একজন মুনাফিকের চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় আর কেউ নেই। মুনাফিক মানেই দ্বিমুখী চরিত্রের বর্ণচোরা লোক। প্রতারক শ্রেণির এই লোকগুলো সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ঘোরতর শত্রু।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বদাই এদের উপস্থিতি ছিল। স্থান, কাল ও সময় ভেদে এদের চেহারা বদলালেও চরিত্র এক ও অভিন্ন। ওপরে বন্ধু সেজে ভেতরে ক্ষতি সাধনে হীন কর্মেই এরা লিপ্ত থাকে সব সময়। ইসলামের ইতিহাসেও এমন গোপন শত্রু ছিল, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। এদের মুখে মধু আর অন্তরে বিষ। এরা গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। ফলে এদের চেনা বড়ো দায়।

‘মুনাফিক’ আরবি শব্দ। ইংরেজিতে বলে Hypocrite। উৎপত্তিগতভাবে মুনাফিক শব্দটি ‘আন-নিফাক’ শব্দ হতে এসেছে। আন-নিফাক শব্দটি এসেছে ‘নাফাকা’ শব্দ হতে। নাফাকা শব্দের বাংলা অর্থ সুরঙ্গ (Tunnel)। সাধারণত প্রত্যেক সুরঙ্গের দুই প্রান্তে দুটি মুখ থাকে। তেমনই মুনাফিকও হলো দুই মুখওয়ালা বা দ্বিমুখী নীতিওয়ালা ব্যক্তি (Two Faced Personality)। মুনাফিকরা দুই দলের কাছে গিয়ে দুই রকম কথা বলে। দুই দলের কাছে দুই রকম চেহারা নিয়ে হাজির হয়। যখন যার কাছে যায়, তখন তার পক্ষে কথা বলে। মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে তাদের এই Double Standard-এর ব্যাপারে বলেছেন—

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ-

‘তারা যখন ঈমানদার লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে—“আমরা ঈমান এনেছি।” কিন্তু শয়তানের সাথে একান্তে সাক্ষাতে বলে—“মূলত আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আর তাদের (ঈমানদারদের) সঙ্গে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র।”’ (সূরা বাকারা : ১৪)

দ্বীন পালনের ক্ষেত্রেও মুনাফিকরা নিজেদের সুবিধামতো নীতি পরিবর্তন করে। নিজের জন্য যা সুবিধাজনক, শুধু সেগুলোই বেছে বেছে গ্রহণ করে। আবার নিজেদের স্বার্থে আঘাত এলে পাশ কাটিয়ে চলে। একই জিনিস নিজের বেলায় সত্য ও সঠিক, কিন্তু অন্যের বেলায় ভুল ও বেআইনি—এটাই হচ্ছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা দুমুখো নীতি। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে মুনাফিকদের ব্যাপারে মুসলিমদের সাবধান করতে অসংখ্য আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ
عَنكَ صُدُودًا-

‘তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই দিকে আসো এবং রাসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন এ মুনাফিকদের দেখবেন—তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্তত করছে এবং পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।’ (সূরা নিসা : ৬৬)

মুনাফিককে দুই মুখওয়ালা বলার হেতু হচ্ছে—মরুভূমিতে একটি প্রাণী আছে, যার নাম ‘আন-নাফিকা’ (النَّفَقَاءُ)। এই প্রাণিটি তার ঘরে দুটি দরজা রাখে, যেন শত্রু একটি দরজা দিয়ে আক্রমণ চালালে বিকল্প দরজা দিয়ে সে পালাতে পারে। এই চরিত্রের প্রাণীর সাথে মিল থাকায় দুমুখো লোকদের বলা হয় মুনাফিক। এখান থেকে মুনাফিকের দ্বৈত চরিত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। মুনাফিক অর্থ দুই চরিত্র বা দ্বিমুখী নীতিওয়ালা মানুষ।

উসরি ইউসরা : কষ্টের সাথে স্বস্তি

সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ নিয়েই মানুষের জীবন। এগুলোকে সাথে নিয়েই জীবনপথ পাড়ি দিতে হয়। দিনের আলো শেষে যেমন রাতের নিকষকালো অন্ধকার নেমে আসাটাই স্বাভাবিক, তেমনই বিপদাপদও মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা।

কিন্তু আমরা অনেকেই এই স্পষ্ট সত্যটি মেনে নিতে চাই না। অলীক সুখের আশায় এই দুনিয়ার মরীচিকার পেছনে লাগামহীন ছুটতে থাকি। দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদে পতিত হলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো— এহেন পরিস্থিতিতে আমরা অনেকে আল্লাহকেই ভুলে যাই! বলে বসি—‘আল্লাহ যদি থাকেই, তবে কেন এত অবিচার?’ ‘আমার ওপরেই কেন এত বিপদ?’ ‘কেন আমার সাথেই সব সময় এমন হয়?’ আসতাগফিরুল্লাহ! কী ভয়ানক চিন্তা লালন করি আমরা!

আচ্ছা, নিজেকে একটু প্রশ্ন করুন তো, বছরে মোট অসুস্থ ছিলাম কয়দিন? মাসে না খেয়ে ছিলাম কয়দিন? উত্তর হচ্ছে—সুস্থ ছিলাম বেশি আর অসুস্থ ছিলাম হাতেগোনা অল্প কয়েকটা দিন মাত্র। কখনো হয়তো অভুক্ত অবস্থায় থাকিইনি, তারপরও জীবন নিয়ে আমাদের হাজারটা অভিযোগ। ‘কেন এমনটা হলো না? কেন ওটা পেলাম না। আমার ভাগ্যটাই একটা কুফা।’ মনে রাখবেন, আপনি যে অবস্থানে থেকে স্রষ্টার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, ওই অবস্থানটা অনেকের কাছে রঙিন স্বপ্ন। আপনি যা পেয়েও খুশি হতে পারেননি, সেটা অর্জনের জন্য অনেকে দিন-রাত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাই হতাশ হওয়া যাবে না। শোকরগোজার হতে হবে। প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

অন্ধকার ছাড়া যেমন আলোর কোনো অস্তিত্বই নেই, তেমনই দুঃখ-কষ্ট ছাড়া সুখের অনুভূতিরও অস্তিত্ব নেই। ক্ষুধা না থাকলে যেমন খাবারের মূল্য বোঝা যায় না, তেমনই কষ্ট না থাকলে সুখের অনুভূতিও উপলব্ধি হয় না। সুখ ও দুঃখ তাই একে অন্যের পরিপূরক।

এবার সুখ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। সুখ সাধারণত তিন প্রকার—

ক. মিছে সুখ : অনেকেই জীবনের দুঃখ-কষ্টকে ভুলতে গিয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মদ, গাঁজা, ইয়াবা, ফেনসিডিল ইত্যাদি সেবন করে। বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয়। তারা ভাবে—এর মাধ্যমেই তার সকল দুঃখ-কষ্ট, যাতনা মুছে যাবে। কিন্তু এসব মিথ্যা সুখানুভূতি ছাড়া কিছুই না; না কোনো স্থায়ী সমাধান (Permanent Solution)।

খ. ক্ষণস্থায়ী সুখ : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সুখ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দুনিয়ার জীবনের সুন্দর উপমা এঁকেছেন। তিনি বলেছেন—

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ-

‘তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়; যেমন একটি বৃষ্টির অবস্থা—যার সবুজ ফসল কৃষকদের চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়।’ (সূরা হাদিদ : ২০)

নশ্বর পৃথিবীতে যদি আমাদের অনেক টাকা-পয়সা, সম্পদ, খ্যাতির প্রাচুর্য থাকে, কিন্তু চিরস্থায়ী পরকালে কিছুই না থাকে, তাহলে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সুখ দিয়ে কী লাভ হবে? আমরা ক্ষণস্থায়ী সুখের পাল্লায় পড়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখের নাটাইকে হাতের নাগালের বাইরে ছেড়ে দিই। পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী সুখের ধোঁকায় আমরা যেন না পড়ি, তাই আল্লাহ তায়ালা আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে—

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى-

‘কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো; অথচ আখিরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।’ (সূরা আ’লা : ১৬-১৭)

রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন

রাগের ক্ষতিকর দিক

কেউ যখন রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তখন তার দেহে অ্যাড্রেনালিন (Adrenaline) নামক একপ্রকার হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। এতে মানুষ উত্তেজিত হয় এবং তার হার্টবিট বেড়ে যায়। এটা অতিমাত্রায় নিঃসরিত হলে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। রাগের কারণে মুখভঙ্গি ও শারীরিক অভিব্যক্তি (Facial Expression & Body Language) বদলে যায়। তার সাইকোলজিক্যাল রেসপন্স অ্যাবনরমাল হয়ে কাজ করতে থাকে। ফলে সে মারাত্মকভাবে রিঅ্যাক্ট করে, চিৎকার-চোঁচামেচি করে, মারামারি করতে চায়, ভাঙচুর করতে চায়। যে হরমোন নিঃসরণ হওয়ার ফলে মানুষ রেগে যায়, সে হরমোনের ধরনটাই এমন। Adrenaline triggers the body's fight response.

এই রাগের কারণে কখনো কখনো—

- ক. পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।
- খ. বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়।
- গ. স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটে।
- ঘ. মারামারি ও হতাহতের ঘটনা ঘটে।

রাগের ক্ষতিকর দিক নিয়ে একটা ঘটনা বলি—

‘একটি ছোট্ট মেয়ে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছে। বাবা নিজের গাড়ির ময়লা পরিষ্কার করছেন। গাড়িটি ধুলোয় একাকার! মেয়েটা হঠাৎ করে একটি চক দিয়ে গাড়িটার ওপর কীসব আঁকিবুঁকি করতে লাগল। এটা দেখে বাবা ভীষণ রেগে গেলেন। হুংকার দিয়ে বললেন—“এত কষ্ট করে পরিষ্কার করছি, আর তুই সেটা নষ্ট করছিস!” বলেই কষে এক চড় বসিয়ে দিলেন মেয়েটির গালে। মারের চোটে মাটিতে পড়ে গেল মেয়েটি। ব্যথায় কাঁদতে শুরু করল। তারপর মনের দুঃখে ঘরের দিকে চলে গেল।

বাবা মেয়ের আঁকিবুঁকির জায়গাটা আবার পরিষ্কার করতে গিয়ে লক্ষ করলেন, সে কিছু একটা লিখেছে। মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলেন, তার মেয়ে ছোট্ট হাতে লিখেছে—“আমার বাবা অনেক ভালো।” অনুশোচনায় দক্ষ হলেন বাবা, কিন্তু ততক্ষণে ছোট্ট মেয়েটির মনে কষ্টের বিশাল ছাপ বসে গেছে।’

আসলে রাগ বা উত্তেজনাকে দমন করতে না পেরে বাবা যে আচরণটি করলেন, তা আর কখনোই তাকে স্বস্তি দেবে না।

শাশ্বত জীবনবিধান

দাওয়াতি কাজের সময় খেয়াল রাখুন

এক. আশাবাদী করুন, হতাশ করবেন না

আজকের এই নৈরাশ্যের পৃথিবীতে মুসলিমদের মনে আশার বীজ বুনতে হবে। আশা মানুষকে উজ্জীবিত করে, অন্যদিকে হতাশা মানুষকে নিরুজ্জীবিত করে। তাই ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যের কথা যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের একটা দারুণ দাওয়াহ অ্যাপ্রোচ শিখিয়ে দিয়েছেন—

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا-

‘তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না এবং (লোকদের) সুসংবাদ দাও, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ো না।’ (সহিহ বুখারি : ৬১২৫)

আমরা অনেক সময় দীনকে খুব কঠিন করে ফেলি। অবস্থাটা এমন, আল্লাহ তায়ালা ছাড় দিতে চাইলেও আমরা ছাড় দিতে চাই না। এতে দীনের ব্যাপারে আগ্রহী অথবা সদ্য দীনে ফেরা ভাই-বোনেরা খুব বিপাকে পড়ে যান। অনেক সময় তারা নিরুৎসাহিত (Di-motivated) হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যান। তাই মানুষকে আশাবাদী করতে হবে, হতাশ করা যাবে না। পরিবর্তন ধীরে ধীরে করতে হয়। সহজ থেকে আস্তে আস্তে কঠিন নিয়মে যেতে মানুষের সুবিধা হয়। শুরুতেই বিশাল বোঝা চাপিয়ে দিলে সেটা ধারণ করার ক্ষমতা অনেকেই রাখেন না।

দুই. সব সময় ভুলের দিকে ইঙ্গিত করবেন না

মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভুলের চেয়ে গুণের কথা বেশি বলুন। এতে সে ইসলামের কথা শুনতে আগ্রহী হবে। আর যত আগ্রহী হবে, ততই সে সত্য বাণী জানতে পারবে। আর জানতে জানতে আস্তে আস্তে নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পাবে। তাই একান্ত প্রয়োজন না হলে (সরাসরি) ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ফোকাস করা থেকে বিরত থাকুন। রাসূল ﷺ নিজের দাওয়াতি আচরণে সরাসরি ত্রুটি ও ভুল ফোকাস করার শিক্ষা দেননি।

স্মার্ট প্যারেন্টিং

সন্তান প্রতিপালনে ইসলামি দিকনির্দেশনা

ভালো মায়ের ব্যবস্থা করুন

ভালো সন্তান লাভের প্রথম পদ্ধতি হলো ভালো মায়ের ব্যবস্থা করা। বিয়ে করার সময় অবশ্যই মাথায় রাখবেন—যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছেন, তিনি হবেন আপনার সন্তানের মা। কারণ, একজন মা একই সঙ্গে প্রোডাকশন হাউজ এবং ট্রেনিং সেন্টার। মা যদি ভালো হয়, তাহলে সন্তানরাও ভালো হয়।

প্রবাদ আছে—

‘বাপ ভালো তো বেটা ভালো, মা ভালো তো ঝি;
গাই ভালো তো বাছুর ভালো, দুধ ভালো তো ঘি।’

প্রতিটি মায়ের গর্ভ একেকটা খনি। এটা সাধারণ কোনো খনি নয়; তেলের খনি, গ্যাসের খনি, স্বর্ণের খনি, পেট্রোলিয়ামের খনির চেয়েও দামি খনি। কারণ, এই গর্ভগুলোই ধারণ করেছে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সব ওলিদের, আল্লাহর নবিদের এবং সকল মহামানবদের। আবার এই নারীদের গর্ভেই বেড়ে উঠেছে পৃথিবীর তাবৎ সব জালিম, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, ধর্ষক, সন্ত্রাসী। এই পার্থক্যের কারণ কী? কারণ হলো—গর্ভধারিণীর ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণগত পার্থক্য।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে—সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে, তখন মায়ের হরমোন সন্তানের শরীরেও প্রবাহিত হয়। আমরা জানি, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ ও অনুভূতির জন্য শরীরে পৃথক পৃথক হরমোন প্রবাহিত হয়। হাসলে এক ধরনের হরমোন প্রবাহিত হয়, কাঁদলে আরেক ধরনের। একইভাবে ভালো চিন্তা করলে এক ধরনের, কূটনামি করলে আরেক ধরনের হরমোন প্রবাহিত হয়। মা যখন ভালো চিন্তা করেন, তখন তার শরীরে যে হরমোন প্রবাহিত হয়, তা সন্তানের শরীরেও প্রবেশ করে। ফলে সন্তান মায়ের উদরে থেকেই ভালো চিন্তা করতে শেখে। আবার মা যখন কূটনামি করেন,

কারও গিবত করেন, মনে হিংসা লালন করেন, তখন সেই হরমোন সন্তানের শরীরেও প্রবাহিত হয়। ফলে সন্তান দুনিয়ায় আসার আগেই এসব বাজে গুণ শিখে যায়। এগুলো নিয়েই সে পৃথিবীতে আগমন করে। অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় মায়ের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, কার্যক্রম—সবকিছুই তার গর্ভে থাকা সন্তানের ব্রেইনে সঞ্চারিত হয়।

গর্ভে আসার চার মাসের মধ্যেই সন্তানের মাঝে শোনার অনুভূতি জাগ্রত হয়। ফলে সে গর্ভে থেকেই শুনতে পায়। মা যা বলে, যা শোনে—সবই সে জঠর থেকে কান পেতে শোনে। মা যদি এই সময়টা কুরআন তিলাওয়াত করে বা শোনে, ভালো নসিহত শোনে, ভালো বই পড়ে, তাহলে সন্তানও মায়ের রেহেম থেকে এসব শুনে প্রভাবিত হতে পারে। সুতরাং মা যদি ভালো কাজ করেন, ভালো কথা বলেন, তাহলে সন্তানও তা আন্তে আন্তে শিখে নেয় এবং সৎ গুণাবলির অধিকারী হয়।

অন্যদিকে মা যখন বাজে কথা বলে, বাজে কাজ করে, অশ্লীল কিছু শোনে বা বলে, তখন বাচ্চাও মায়ের উদর থেকে এসব বদগুণ শিখে ফেলে। তাই মায়ের হতে হবে খুবই সতর্ক। যে চরিত্রের বাচ্চাকে কল্পনা করেন, সেই চরিত্রে আগে নিজেকে সাজান। তাহলে সন্তান আপনা থেকেই অর্ধেক চরিত্রবান হয়ে যাবে।

যারা এখনও বিয়ে করেননি, তাদের মনে রাখতে হবে—আপনাদের অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসবে আপনার স্ত্রীর মাধ্যমেই। সুতরাং যখন বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজবেন, তখন শুধু স্ত্রীই খুঁজবেন না; পাশাপাশি আপনার অনাগত প্রজন্মের মাকেও খুঁজুন। কারণ, সন্তানকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য মায়ের ভূমিকা শিক্ষকের চেয়েও বেশি।

ভালো বাবা হোন

ভালো সন্তান পাওয়ান জন্য ভালো বাবা হওয়া আবশ্যিক। নিজে ভালো না হয়ে ভালো সন্তান আশা করা বোকামি। বাবা হিসেবে সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলো আগে পালন করতে হবে, নিজেকে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে, তারপর সন্তানের থেকে উত্তম আচরণ আশা করতে হবে। অনেক বাবা আছেন—যারা সারা জীবন নিজে অপরাধের সাগরে হাবুডুবু খায়, কিন্তু সন্তানকে নিষ্কলুষ হিসেবে দেখার প্রত্যাশা করেন। এটা ইনসানফের প্রত্যাশা হতে পারে না।

একবার উমর ফারুক رضي الله عنه-এর কাছে এক বাবা এসে বিচার দিলেন—
‘আমিরুল মুমিনিन! ছেলে তো আমার কথা শোনে না, বেয়াদবি করে।’

উমর رضي الله عنه সন্তানকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন—‘তোমার বাবার সাথে
বেয়াদবি করো?’

ছেলে বলল—‘হে আমিরুল মুমিনিন! সব দায়-দায়িত্ব কি শুধু আমাদেরই?
বাবা-মা’র কোনো দায়িত্ব নেই?’

উমর رضي الله عنه বললেন—‘অবশ্যই আছে। বাবার তিনটি দায়িত্ব—

- সন্তানের জন্য ভালো মায়ের ব্যবস্থা করবে।
- সন্তানের ভালো নাম রাখবে।
- সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেবে।’

এবার ছেলে বলল—‘আমার বাবা এই তিনটির একটিও করেননি। আমার বাবা
বিয়ে করেছেন এক নিখো নারীকে; যিনি এক অগ্নি উপাসকের দাস ছিলেন।

তিনি আমার নাম রেখেছেন খুনফাসা (خُنْفَسَاءُ অর্থ—গোবরে পোকা। অন্য
বর্ণনায়—চামচিকা)। আর কুরআনের একটি অক্ষরও তিনি আমাকে শেখাননি।’

উমর رضي الله عنه এবার সেই বাবাকে বললেন—‘সন্তানের প্রতি তুমি নিজের দায়িত্ব
পালন করোনি, আর এসেছ তার বিরুদ্ধে বিচার দিতে!’ (আবুল লাইস
সমরখন্দি রচিত তানবিহুল গাফিলিন)

প্রতিটি শিশু বাবাকে হিরো মনে করে। বিশ্বাস করে—বাবা যা করে, তা-ই সঠিক।
এজন্য তারা বাবাকে অন্ধ অনুকরণ করে। আপনি যদি মানুষের সাহায্য করেন,
সময়মতো নামাজ পড়েন, মিথ্যা থেকে দূরে থাকেন, ভালো কাজে অনড় থাকেন,
তাহলে বাচ্চাও আপনাকে দেখে শিখবে। আর আপনি যদি সিগারেট খান, অশ্লীল
সিনেমা-গান দেখেন, মানুষকে গালি দেন, মোবাইলে মিথ্যা বলেন, ক্ষমতার অবৈধ
ব্যবহার করেন, তাহলে বাচ্চাও আপনাকে দেখে এসব শিখবে।

কোন পরিস্থিতিতে আমরা কী করি, বাচ্চারা তা খুব মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করে। আপনার ড্রাইভার এক ঘণ্টা দেরি করে এলে আপনি যখন তার সাথে খারাপ আচরণ করেন, তখন আপনার সন্তান এই খারাপ আচরণ শিখে নেয়। পরবর্তী জীবনে সে ঠিক এই আচরণই করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। কাজের বুয়া তরকারিতে একটু বেশি ঝাল দিলে আপনি যখন তার গোষ্ঠী উদ্ধার করে গালাগাল দেন, কাজের মেয়েটা একটা প্লেট ভেঙে ফেললে যখন তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন, বাসায় বসে ফোনে যখন বলেন—আপনি বাসায় নেই, তখন এগুলো আপনার কোমলমতি সন্তানের মন-মগজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা এগুলো দেখে প্রভাবিত হয়। সন্তান আপনাকে যেমন দেখে, তেমনই শেখে। তাই ভালো সন্তান পাওয়ার জন্য আগে ভালো বাবা হওয়ার চেষ্টা করুন।

নেককার সন্তানের জন্য দুআ করুন

নিজের দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে আল্লাহর কাছে উত্তম সন্তানের জন্য দুআও করতে হবে। আপনি চাইলেই ভালো সন্তান পাবেন না, যদি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেন। চক্ষু শীতলকারী সন্তান পেতে অবিরত দুআ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই দুআ আমাদের শিখিয়েছেন—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيًّا طَيِّبًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا-

‘হে আমাদের রব! আমাদের এমন জীবনসঙ্গী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা চক্ষু শীতলকারী হবে। আর আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।’

(সূরা ফুরকান : ৭৪)

মসজিদ : মুসলিম উম্মাহর নিউক্লিয়াস

মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তুলতে করণীয়

সত্যিকারার্থে আপনি যদি একটি নামাজি সমাজ কিংবা নামাজি প্রজন্ম দেখতে চান, তাহলে শিশু ও তরুণদের মসজিদমুখী করতে হবে। যে প্রজন্ম অভ্যাসগতভাবেই মসজিদমুখী, সে প্রজন্ম স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণকামী হয়। অন্যদিকে নতুন প্রজন্ম যদি মসজিদ না চেনে, তাহলে তারা বিকল্প জায়গা খুঁজে নেবে এবং বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। কিশোর গ্যাং, মাদকাসক্তি ও ধর্ষণ বিস্তার তার চাক্ষুষ প্রমাণ। তাই সুন্দর ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে মসজিদমুখী প্রজন্ম গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

তরুণদের মসজিদমুখী করার জন্য ছোটো বয়স থেকেই তাদের মসজিদে নিয়ে আসতে হবে। মসজিদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে মসজিদের আদবগুলো শেখাতে হবে। মাঝেমধ্যে ছোটোখাটো পুরস্কার হিসেবে চকলেট-চিপস দেওয়া যেতে পারে। বাচ্চারা যেহেতু নতুন জামা পরতে ভালোবাসে, তাই মসজিদে আসার জন্য তাদের নতুন জামা কিনে দেওয়া যেতে পারে অথবা অপেক্ষাকৃত ভালো জামাটি পরানো যেতে পারে—এতে তাদের আগ্রহ প্রবল হবে।

বাচ্চারা সাধারণত একটু দুষ্ট স্বভাবের হয়। তারা সুযোগ পেলেই হাসি, কান্না, ছোটোছুটি, হইহুল্লোর ইত্যাদি করতে ভালোবাসে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, তারা এর ভালো-মন্দ প্রভাব বুঝতে পারে না। তারা যদি বুঝত, তাহলে দুষ্টমি করত না। বাচ্চা থাকতে আপনিও এমন করেছেন। আর এ রকম দুষ্টমি খুনশুটি বাচ্চাদেরই মানায়। বড়োরা এমনটা করলে মানাবেও না; বরং মানুষ তাদের পাগল বলবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের একটু সজাগ হতে হবে। মসজিদে যাতে তারা এসব না করে, এজন্য বাড়িতেই তাদের বোঝাতে হবে। নিয়মিত বোঝালে তারা একসময় মসজিদের পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

অভিভাবকদের উচিত সন্তানকে পাশে নিয়ে নামাজে দাঁড়ানো। এতে তারা দুষ্টমি করার সুযোগ পায় না। আর পেছনের কাতারে পাঠিয়ে দিলে তারা আরও বেশি করে দুষ্টমি করার সুযোগ পায়। মসজিদে আসা-যাওয়ার পথে গল্লোচ্ছলে তাদের মসজিদের আদব-কায়দা ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিখিয়ে দিতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে—এটা আমাদের ইবাদতগৃহ, এটা পবিত্র জায়গা। এখানে দুষ্টমি করতে হয় না। এখানে নীরবে সুন্দর পরিবেশে, ভদ্রভাবে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করতে হয়। এভাবে বুঝিয়ে বললে ধীরে ধীরে মসজিদের আদব সম্পর্কে ওরা সচেতন হয়ে উঠবে।

নিজের সন্তান ছাড়াও মসজিদে আরও যেসব শিশু আসে, তাদের আদর করতে হবে, প্রসংশা করতে হবে। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন, উৎসাহ দিন, সুযোগ থাকলে তাদের নিয়ে গল্প করুন, নবি-রাসূলদের গল্প শোনান। কখনো কখনো তাদের চকলেট, কলম, বই, ফলমূল উপহার দিন। এতে তারা আনন্দিত হবে, মসজিদকে উপভোগ করতে শিখবে, মসজিদকে নিজের মনে করবে এবং মসজিদে আসার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে।

মনে রাখবেন, বড়োদের নামাজি বানানো খুব কঠিন, কিন্তু ছোটোদের মসজিদমুখী করা খুবই সহজ। তাই দাওয়াতি কাজের একটা বড়ো সময় ছোটোদের পেছনেই ব্যয় করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও শিশুদের মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং তাদের দুষ্টমি সহ্য করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, তখন তাঁর প্রিয় নাতি ইমাম হাসান ও হুসাইন ﷺ তাঁর কাঁধে চড়ে বসতেন। ফলে তিনি সিজদা থেকে উঠতে পারতেন না, দীর্ঘ সময় ধরে সিজদায় থাকতে হতো তাঁকে। তবুও তিনি নাতিদের সঙ্গে রাগ বা খারাপ আচরণ করতেন না। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬৯৭০)

আবু কাতাদাহ রা. বর্ণনা করেন—

‘রাসূল ﷺ তাঁর নাতি উমামাহ রা.কে কাঁধে করে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। রাসূল ﷺ ইমামতির জন্য নামাজের স্থানে দাঁড়ালে আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম, অথচ সে (উমামাহ রা.) তাঁর স্থানে তথা রাসূল ﷺ-এর কাঁধেই আছে। রাসূল ﷺ নামাজের তাকবির দিলেন, আমরাও তাকবির দিলাম। রাসূল ﷺ রুকু করার সময় তাঁকে পাশে নামিয়ে রেখে রুকু ও সিজদা করলেন। সিজদা শেষে আবার দাঁড়ানোর সময় তাঁকে আগের স্থানে উঠিয়ে নিতেন। এভাবে নামাজের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাকাতেই তিনি এমনটি করেছেন।’ (সুনানে আবু দাউদ : ৯১৮)

এ ছাড়াও নবিজির খুতবা দেওয়ার সময় কলিজার টুকরা দৌহিত্র হাসান-হুসাইন এলে তিনি খুতবা বন্ধ রেখে তাঁদের জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। কোলে তুলে নিতেন এবং চুম্বন করতেন। আর বলতেন—‘খুতবা শেষ করা পর্যন্ত আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না। তাই খুতবা দেওয়া বন্ধ করেই এদের কাছে চলে এসেছি।’ (সুনানে আবু দাউদ : ১১০৯)

সুবহানাল্লাহ! রাসূল ﷺ ছোটো বাচ্চাদের কাঁধে নিয়ে নামাজ পড়তে পারেন, জুমার খুতবা থামিয়ে নাতিদের কোলে তুলে নিতে মিস্রার থেকে নেমে আসতে পারেন। আর আমরা মসজিদে বাচ্চাদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারি না। মসজিদে বাচ্চা দেখলেই চৈচিয়ে উঠি।

বাচ্চারা দুষ্টমি করবে—এটাই স্বাভাবিক। আবার অনেকে বলে থাকেন, এখনকার বাচ্চারা একটু বেশিই দুষ্ট। হ্যাঁ, এটিও ঠিক; কিন্তু তাই বলে তো আপনি বাচ্চাকে ধমক দিলে হিতে বিপরীত হবে। কেননা, যে একবার ধমক খাবে, সে পরবর্তী সময়ে মসজিদে আসতে ভয় পাবে। বাচ্চাদের যদি মসজিদ থেকে দূরে রাখেন, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে মুসল্লিই থাকবে না—এই ব্যাপারটি কি কখনো চিন্তা করেছেন? ধমকের শিকার হলে হয়তো বাচ্চারা ভাবতে পারে, মসজিদে গিয়ে ধমক খাওয়ার চাইতে বাসায় বসে ভিডিও গেমস খেলাই ভালো।

যে সমাজের মসজিদগুলো শিশু-কিশোরদের পদচারণায় মুখর থাকে, সেই সমাজে মুসল্লির অভাব হয় না। আমরা যদি মসজিদে অধিক পরিমাণে কিশোর, তরুণ-যুবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে রাতারাতি এ সমাজ বদলে যাবে। মাদকসেবী কমে যাবে, ধর্ষণ, ইভটিজিং বন্ধ হবে, নতুন করে আর কোনো কিশোর গ্যাং গড়ে উঠবে না। আমরা পাব মসজিদমুখী এক আলোকিত তরুণ প্রজন্ম।

যোগ্য ইমাম নিয়োগ

মসজিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন ইমাম সাহেব। একটি আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে তিনিই হবেন মূল কারিগর। এজন্য তাঁকে হতে হবে খুবই চৌকশ, দক্ষ, জ্ঞানী ও অনুসরণীয় চরিত্রের অধিকারী। সমাজে কী চলছে, কী সমস্যা বিরাজ করছে, তা ত্বরিত গতিতে চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণই হবে ইমাম সাহেবের অন্যতম প্রধান কাজ। তিনি হবেন সকল শ্রেণির মানুষের কাছে

গ্রহণযোগ্য ও রোলমডেল। সব শ্রেণির মানুষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। দ্বীনি সমস্যা, মানসিক সমস্যা, বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা, বার্ধক্যকালীন সমস্যা, মাদকাসক্তি, ক্যারিয়ারবিষয়ক দিকনির্দেশনা, উন্নয়ন ভাবনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তিনি একজন যোগ্য পরামর্শক ও সংগঠক হিসেবে কাজ করবেন। এই সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যে ধরনের মেধা, মনন, যোগ্যতা, কর্মস্পৃহা, সৃজনীশক্তি ও নেতৃত্বের গুণাবলি দরকার, তার সমস্ত কিছুতেই ইমাম সাহেবকে বলীয়ান হতে হবে।

যে ইমাম এগুলো করতে পারেন না, তিনি কীভাবে ইমাম হতে পারেন? নামাজ তো অনেকেই পড়াতে পারেন, তাহলে আলাদা করে আর ইমাম রাখার প্রয়োজন কী? মূলত ইমাম তিনিই হবেন—যিনি সঠিক পথ চেনেন, সে পথে এগোতে পারেন এবং অন্যকে পথ দেখাতে পারেন (Who knows the way, who goes the way, who shows the way and then he's Imam)।

একজন যোগ্য ইমাম হওয়ার জন্য শরয়ি যোগ্যতার পাশাপাশি আরও যেসব প্রয়োজনীয় গুণ থাকা আবশ্যিক, তা হলো—

ক. ঐক্য বজায় রাখার ক্ষমতা : একজন ইমামের অন্যতম প্রধান কাজ হলো—সমাজে ঐক্য বজায় রাখা। একটি সমাজে অনেক মত, মাজহাব ও দলের লোক থাকে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চিন্তা ও বিশ্লেষণ থাকে। ঈমান ও আমলের দিক থেকেও থাকে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ইমাম সাহেবের কাজ হলো—সবার মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি ধরে রাখা। ভিন্ন মতকে উড়িয়ে না দিয়ে সম্মান এবং পরস্পরের মধ্যে মিলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। বিভিন্ন মতের মুসলিমদের মধ্যে তাওহীদের ভিত্তিতে সমঝোতা করার চেষ্টা করা। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই ইসলামের মৌলিক প্রাণসত্তার সাথে আপস করে কৃত্রিম সমঝোতা কাক্ষিত নয়।

খ. নিজেকে আপডেট রাখা : একজন ইমাম সমসাময়িক বিষয়ে অনেক বেশি আপডেট থাকবেন। তিনি সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ের হালচাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখবেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংকট নিয়ে গবেষণা করবেন, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে সমস্যার কারণ ও উত্তরণের পথ উদ্ঘাটন করবেন। অতঃপর এই বিষয়ে জুমার খুতবায় প্রাণবন্ত আলোচনা এবং জনগণকে সচেতন করবেন। সর্বোপরি তিনি সংকট মোকাবিলায় জনগণকে দায়িত্বশীল হতে শেখাবেন। এতে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেবেন।

গ. ভাষার দক্ষতা : একজন ইমাম ভাষা ও বাগ্মিতায় হবেন পারদর্শী। তিনি মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবি ও ইংরেজি ভাষায়ও দক্ষ (Expert) হবেন। এগুলোর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ভাষাও দখলে রাখতে পারেন। শুদ্ধ উচ্চারণ, প্রাজ্ঞল ও সাবলীল উপস্থাপন, সুন্দর বাচনভঙ্গি, উপযুক্ত ও পরিশীলিত শব্দচয়ন এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজে পারদর্শী হবেন। তিনি হবেন যেকোনো বিষয় আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনে দক্ষ। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ইমামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

তারা ইমামকে আইকন হিসেবে গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। ফলে ইমামগণ সাধারণ মানুষের সামনে দীনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের বেশি বেশি সুযোগ পাবেন।

ঘ. সাবলীল উপস্থাপনার সক্ষমতা : উপস্থাপনা একটি শিল্প। কোনো বিষয়ে যেনতেন দায়সারা উপস্থাপনা করা হলে বিষয়টি গুরুত্ব হারায়। আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য সুন্দর ও সাবলীল উপস্থাপন খুবই জরুরি। মুসল্লিদের মন-মেজাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানসিক অবস্থা বুঝে কথা বলতে পারলে তাদের শেখানো, বোঝানো এবং প্রভাবিত করা সম্ভব হবে। শ্রোতামণ্ডলী যে ভাষায়, যে পদ্ধতিতে বুঝবে, সেভাবেই কথা বলতে হবে। ইমাম সাহেব যদি শহরের মসজিদগুলোতে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন, তাহলে তা আবেদন হারাতে বাধ্য। আবার খুব গ্রামীণ পরিবেশে আপনি যদি আরবি ও ইংরেজি দিয়ে কথা বলেন, তাহলে সেটিও আবেদন হারাতে পারে। রাসূল ﷺ-এর উপস্থাপনাভঙ্গি ছিল অসাধারণ। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন কাফির-মুশরিক সবাই মিলে তাঁর কথা শুনত। তিনি বলতেন অল্প, কিন্তু তাঁর কথামালার আবেদন ছিল অনেক বেশি—যা উপস্থিত শ্রোতাদের বিমোহিত করত।

ঙ. আস্থাবান হওয়া : ইমাম সাহেবকে অবশ্যই আস্থাবান হতে হবে। তাঁকে এমন যোগ্য ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে—যাতে সর্বসাধারণ তাদের সাথে কথা বলতে, তাদের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করতে এবং সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ করতে উৎসাহী হয়। ইউরোপ-আমেরিকার অনেক মসজিদে ইমামদের সাথে কনসাল্টেশন টাইম মেইনটেইন করতে হয়। ওই নির্ধারিত সময়ে তিনি লোকজনের সমস্যার কথা শোনে এবং ইসলামের আলোকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমাদের সমাজে অনেক সহজ-সরল মানুষ থাকে, তারা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য যার-তার কাছে ধরনা দেয়। কিছু বাজে লোক এই সুযোগে তাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে।

ইমাম সাহেব যদি আস্থার প্রতীক এবং যোগ্যতর হন, তাহলে সকল শ্রেণির মানুষ তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবে এবং প্রতারণা থেকে নিস্তার পাবে। সমাজে ভালো মানুষের যখন প্রভাব বাড়ে, তখন প্রতারকদের দৌরাত্ম্য কমে যায়।

চ. অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া : ইমাম সাহেবকে কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, লেনদেন, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, চিন্তা-গবেষণা ও প্রোডাক্টিভিটিতে হতে হবে রোলমডেল। মানুষ যেন তাঁকে দেখে সকল ক্ষেত্রেই প্রেরণা নিতে পারে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁকে অনুসরণ করে। তিনি নিজেকে দাওয়াতি চরিত্রের উপমা হিসেবে উপস্থাপন করবেন। কারণ, মানুষ কথার চেয়ে কাজকেই বেশি অনুসরণ করে।

ছ. নেতৃত্বের গুণাবলি থাকা : সমাজের বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়া এবং সমস্যার সমাধানের জন্য ইমাম সাহেবকে অবশ্যই নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন হতে হবে। সমাজের নেতৃত্ব যদি ইমাম সাহেবের মতো ভালো মানুষরা দিতে পারেন, তাহলে সেই সমাজ পরিবর্তন হতে বেশি সময় লাগবে না। ইমাম সাহেব যেমন নামাজের নেতৃত্ব দেবেন, তেমনি সমাজের উন্নয়ন এবং ভালো কাজের নেতৃত্বও দেবেন।

জ. গবেষক হওয়া : জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে ইমাম সাহেবদের অবশ্যই ভালো গবেষক হতে হবে। গভীর জ্ঞান ছাড়া জাহেলিয়াতকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এজন্য কুরআন-হাদিসের জ্ঞানের পাশাপাশি কনভেনশনাল জ্ঞানেও ইমাম সাহেবদের সমানভাবে পারদর্শী হতে হবে। ইমাম সাহেবগণ যখন ভালো চিন্তক ও গবেষক হবেন, তখন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাঁরা আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

ঐশী বরকতের চাবি

রিজিক কী

রিজিক আরবি শব্দ, এর অর্থ জীবনযাপনের উপায়-উপকরণ। রিজিক বলতে শুধু খাবারকেই বোঝায় না; বরং মানুষের যাবতীয় চাহিদাকে বোঝায়। মানুষ যা খায়, যা পরে, যা ভোগ-উপভোগ করে—সবই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। তাই হারাম উপার্জন দিয়ে যা কিছুই ভোগ করা হোক না কেন, সবই হারাম রিজিক বলে বিবেচিত হবে।

রিজিকের প্রধান অনুষঙ্গ হলো খাদ্য। এই খাদ্য প্রধানত দুভাবে হারাম হতে পারে—

১. আল্লাহর ঘোষণার মাধ্যমে। যেমন : মদ, শূকরের গোশত, রক্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জাবাইকৃত পশুর গোশত ইত্যাদি।
২. খাদ্য নিজে হালাল, কিন্তু হারাম উপার্জন দিয়ে ক্রয় করার মাধ্যমে। যেমন : রুটি একটি হালাল খাদ্য, কিন্তু তা হারাম উপার্জন দিয়ে ক্রয় করলে রুটিও হারাম হয়ে যায়।

এ ছাড়াও কিছু মূলনীতি রয়েছে—যেগুলোর ভিত্তিতে খাদ্যের হালাল-হারাম চিহ্নিত করা যায়। একটু সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ!

হালাল খাদ্য সব সময়ই পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত, রুচিশীল। এটাতে কোনো ভেজাল থাকে না। হালাল অল্প খেলেও তৃপ্তি আসে। কারণ, এর মধ্যে থাকে বরকত।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ-

‘হে মানুষ সকল! পৃথিবীতে যত হালাল ও পবিত্র খাবার রয়েছে, তা খাও;
কিন্তু শয়তানের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’
(সূরা বাকারা : ১৬৮)

এই আয়াতে হালাল রিজিকের সাথে শয়তানের প্রসঙ্গ আনার কারণ হলো— শয়তান মানুষের সামনে হারাম জিনিসকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে। বোঝাতে চায়—হারামেই আরাম। তাই মানুষ শয়তানের ফাঁদে পড়ে হারাম পথে পা বাড়ায় এবং ধীরে ধীরে পাপসাম্রাজ্যের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে।

অনেকেই হারাম উপার্জন দিয়ে হালাল খাবার খোঁজেন। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। এটা নিজের সাথে একধরনের প্রতারণাও বটে। হোটеле মুরগি খান না মৃত মুরগি বিক্রির সম্ভাবনা আছে বলে। গরু খান না কুকুরের গোশত গরুর নামে চালিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা আছে বলে। অথচ অবলীলায় সুদ খাচ্ছেন, ঘুস খাচ্ছেন—সে ব্যাপারে কোনো খেয়ালই করেন না। যে কাপড় পরে আছেন, যে গাড়িতে চড়ে এসেছেন, এমনকী যে টাকা নিয়ে খেতে এসেছেন—সেটাও অন্যের হক মারার টাকা! এগুলো যে আরও ভয়ানক হারাম, তা যেন মনেই আসে না। অনেকে তো হারামের টাকা দিয়ে হজ-উমরাহ করে এসে বিশাল হাজি সাহেব বনে যান! অথচ তারা জানেন না, উপার্জন হালাল না হলে কোনো দুআ আর ইবাদতই কবুল হয় না।

বিশ্বনবি এক লোকের উদাহরণ দিয়ে বলেন—

‘এক লোক সফরে বের হয়। দীর্ঘ পথ। একসময় তার শরীরে ক্লান্তি এসে ভর করে। চুল এলোমেলো হয়ে পড়ে। সারা শরীর ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যায়। ধূলির আস্তরে ঢাকা পড়ে তার পোশাক। একসময় সে আকাশের দিকে হাত তুলে দুআ শুরু করে—“হে আমার রব! হে আমার রব!” অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, যে পোশাক পরে আছে সেটাও হারাম। হারাম দিয়েই সে লালিত-পালিত হয়েছে। এ অবস্থায় তার দুআ কবুল হবে কী করে?’ (সহিহ মুসলিম : ১০১৫)

অনেকেই ভাবেন, হালাল রিজিক দিয়ে জীবনযাপন করা খুবই কঠিন। কারণ, হালাল জিনিস খুবই অপ্রতুল। এই ধারণা শয়তানের কুমন্ত্রণার ফল। প্রকৃত অর্থে আল্লাহর দুনিয়ায় অল্প কিছু ক্ষতিকারক জিনিস বাদ দিয়ে সবকিছুই হালাল। আমরা যদি এই স্বল্পসংখ্যক হারাম থেকে বেঁচে চলতে পারি, তাহলে অবলীলায় আমরা হালাল রিজিক দিয়ে জীবন সাজাতে পারব।